Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIII, Issue-I, October 2024, Page No.78-86
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

গীতিকবিতা, সনেট ও মধুসূদন

গৌরব নাথ
স্বাধীন গবেষক, স্নাতক বাংলা বিভাগ, গভ. ডিগ্রি কলেজ, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা, ভারত

Abstract:
In a chronological discussion of the forms and structures of lyric poetry and sonnets, it is notable to examine the similarities and differences between the two. Both have had influences in Bengali literature since the 19th century. The essence and flavor of lyric poetry and sonnets are entirely distinct. While lyric poetry existed in Bengali before the 19th century, the sonnet's expansion occurred during this period. It's worth mentioning that the Charyapada and the Shreekrishna Kirtan contain 14-line poems, but they are not sonnets. Petrarch had discovered this form in Italy before the 19th century, but it was Madhusudan who introduced it to Bengali literature after that. Although there is an intimate connection between sonnets and lyric poetry, substantial differences remain, as identified by Madhusudan. He brought the taste of meter into Bengali literature through sonnets, marking a revolution. While lyric poetry may seem somewhat subdued, the distinctiveness of sonnets is well recognized. Although Madhusudan's sonnets exhibit artistic finesse, variations in subject and theme suggest that while they can be considered the cradle of Bengali sonnets, they do not fully qualify as structured sonnets.

Keywords: Madhusudan, Sonnets, Lyric poetry, Petrarch, Wodsworth, 19th century.

"অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়"

এই ধরনের সনেট সম্পর্কে ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁর 'Nuns fret not at their convent's narrow room' কবিতায় বলেছিলেন— "...'t was pasttime to be bound/within the sonnet's scanty plot of ground." তার সঙ্গেই লক্ষ্যনীয় সনেট রচয়িতা রসেটির কথাও। তিনি ওয়ার্ডসওয়ার্থের সাথে তাল মিলিয়ে 'A house of life' গ্রন্থে এই সীমায়িত পরিসরের দুরূহ ও আয়াসসাধ্য কাজকে বলেছিলেন '...Sonnet is a moment's monument'। সম্ভবত সনেটে প্রযুক্ত নানান বন্ধনের জন্যই কেউ কেউ তাকে গীতিকবিতার অন্তর্ভুক্ত করতে চাননি। প্রধানত সিসিল ডে লুইস এর এই না চাওয়ার নেপথ্যের কারণ খুঁজতে গেলে সমালোচক হাডসনের নিম্নোক্ত কথাকে বুঝে নিতে হয়। সনেটের এই বিভাগটি করা হয়েছিল 'wholly on the basis of form' অনুযায়ী এবং তাঁর যুক্তি এই যে— "the theoretical system of the Sonnet should, however, be carefully analysed and mastered by every student of poetic technique."[১]

তাই সনেটের এই বন্ধন সম্পর্কিত বিষয়টি বুঝে নিতে নিশ্চিতভাবে তার আঁতুড়ঘরের দিকে ঘেঁটে দেখা প্রয়োজন। এই যে এতকাল অবধি দ্বন্দ্ব সনেট গীতিকবিতা কিনা? বিষয় ও ভাবের গভীরতার দিকে সাধারণ গীতিকবিতার সঙ্গে সনেটের কী কোনো পার্থক্য রয়েছে? এগুলোর নিরসন খুঁজতে গিয়ে ওয়াটস-ডানটনের কথাকে প্রাথমিকভাবে যখন দেখি তখন দেখা যায়, তাঁর বিভাজন অনুসারে গীতিকাব্যসাহিত্যের যে দুটি বিভাগ রয়েছে- গীতিকথা ও কাব্যীভূত কথা বা 'poetised didactics'(তাঁর কথায়); সেক্ষেত্রে গীতিকথার দিকে সনেটের ঝোঁক খুব একটা নয়। কিন্তু এদিকে কাব্যীভূত তত্ত্বকথার দিক দিয়ে ভাবলে একমাত্র না হলেও সনেট ঐ ক্ষেত্রে সার্থক কাব্যশৈলী। আসলে, ওয়াটস-ডানটন হয়ত প্রত্ন গীতিকবিতার সঙ্গে আধুনিক গীতিকবিতাকে গুলিয়ে ফেলেছিলেন। যাইহোক, প্রথমটা বিষয় বা ভাবের কেন্দ্রীভূত হয়েই অবশ্য থেকে গেছে আর দ্বিতীয়টা কবিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। আসলে আধুনিক গীতিকবিতায় কবি আনুগত্য বা অনুসৃতির বশবর্তী না হয়ে আত্মবীক্ষণের আলোকে আত্মানুসরণই করে থাকেন। 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা'ই আধুনিক গীতিকবিতার মূল আত্মকথা। আধুনিক গীতিকবি মনের মাধুরী মিশিয়ে বস্তুজগতকে নিজের করে তোলেন, তারপর 'ভাবকে নিজের করিয়া সকলের করা'র কাজটা করেন। তাই আধুনিক গীতিকবিতার শিল্প, শিল্পী নিরপেক্ষ নয়। এটাই আগের 'গীতিকথা' আর এখনকার 'কবিকথা'র মধ্যে মূল পার্থক্য। এছাড়াও প্রাচীন ও আধুনিক মনের বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বিপরীতমুখী অবস্থান কাজ করছে সেক্ষেত্রে। আগের মানসিকতায় ছিল ঋজুতা ও সারল্য, এখন তা হয়ে ওঠেছে বক্র ও জটিল। প্রাচীন মনে একটি মাত্র সুরের লীলা বা Melody দেখা যেত এবং আধুনিক সময় এসে তা অনেক বিচিত্রতার সুরে একীভূত বা harmony হয়ে ওঠেছে। আধুনিক মনের এই মিশ্র সুরসঙ্গীত-ই সার্থক রূপ ধারণ করেছে সনেটে। তাছাড়া, একটু ভেতরে ঢুকে তাকালে বোঝা যায় আসক্তি-মুক্তি-লীলার তত্ত্ব শিল্পসৃষ্টির মূল তত্ত্ব হলেও সনেটের ক্ষেত্রেই যেন এর বিশেষত্ব ও সত্যতা গৃহীত হয়েছে। সনেটের এই আসক্তি-মুক্তি-লীলা শুধু তত্ত্ব রূপেই নয়, শিল্প রূপেও সত্য। কারণ সাধারণ গীতিকবিতার অন্যান্য কোনো শিল্পরীতিতে ভাব-প্রকাশের মাধ্যমে এই আসক্তি-মুক্তি-লীলা এতটা স্পষ্ট ও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। রবীন্দ্রনাথের 'বাঁধন পরায় বাঁধন খোলায়' এর তত্ত্বের দিকে তাকালে বোঝা যাবে যে, সৃষ্টিমর্মের এই বাঁধন পরানো ও খোলানোর নিরন্তর লীলারস যখনই কবির হৃদয়ে খেলা করে তখনই গড়ে ওঠে classic ও সার্থক সনেট। বলাইবাহুল্য, এনিড হোমারের কথা মানলে বোঝা যায় যে, সনেটের এই আসক্তি-মুক্তি-লীলার মূলীভূত প্রতীপ-ধর্মিতা গত দুই শতক ধরে বিবর্তিত হয়ে আসার ফলে উদ্দীপন-বিভাবরূপে রূপায়িত হয়ে চলেছে ভাব ও ভাবনার ভারসাম্য। ফলত শুরু হয়েছে ঐহিক থেকে পরলৌকিক অথবা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য থেকে অতিন্দ্রীয়ের অভিযান। কিন্তু সবজায়গায়ই যে এমনটা হয়েছে, তা নয়। কবিমনের ইচ্ছে অনুসারেই এই গতিপথ তৈরি হয়। কিন্তু যে পথেই হোক না কেন, প্রতীপ-রহস্যের দ্বন্দ্বকে নিরসন করেই কিন্তু অনন্ত লীলারস উপভোগের পরমানন্দে কবির মন সকল বন্ধন ভাঙে। আর এখানেই সাধারণ গীতিকবিতার সঙ্গে সনেটের পার্থক্য। উপরোক্ত বিপরীতমুখী বৈচিত্র্য যেমন— সামান্য থেকে বিশেষে, বিশেষ থেকে সামান্যে, প্রস্তুত থেকে অপ্রস্তুতে, অপ্রস্তুত থেকে প্রস্তুতে, তত্ত্ব থেকে ভাবে, ভাব থেকে তত্ত্বে ইত্যাদি অসংখ্য উপায়ে ভাব বন্ধন থেকে বন্ধনমুক্তির যাত্রার ফলে প্রতিটি সার্থক সনেট তার গীতিধর্মিতা ও সংগতি সৃষ্টিতে নবীনতর উদাহরণ রেখে গিয়েছে এবং এখনও যাচ্ছে। আর এ জন্যই তৈরি হয়েছে কবির অসীম স্বাধীনতা। ফলত প্রত্যেক কবির সনেটের মধ্যে তৈরি হয়েছে রূপ ও রসগত পার্থক্য। এই ব্যাপারটাকে টি.এস এলিয়েটের বক্তব্যের মাধ্যমে আরো বলিষ্ঠ করা যেতে পারে— "In a perfect what

you admire is not so much the author's skill in adapting himself to the pattern as the skill and and power with which he makes the pattern comply what with he has to stay."[২]

সুতরাং এটা বলা যেতে পারে যে একটা অখন্ড ও সংহত ভাবকল্পনার প্রকাশে কোনো বন্ধনই সনেটে তেমন প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে না। বরং ভাবের গভীরতায় ফাঁকি পড়লে তার সকল আঙ্গিকগত বন্ধনও তুচ্ছ হয়ে যায়। অতএব সনেটের বন্ধন কঠিন হলেও সেটাই সর্বোচ্চ নয় বলেই বোধহয় শিল্পীরা ভালোবেসে স্বীকারোক্তি করেছিলেন—

"ভালবাসি সনেটের কঠিন বন্ধন,
শিল্পী যাহে মুক্তি লভে, অপরে ক্রন্দন।"[৩]

আর এই 'অপরে ক্রন্দন' করার সুযোগটাই জীবনবোধ ও তজ্জন্য গঠিত অতৃপ্তিমূলক যন্ত্রণার সুরে বাংলা ভাষায় বাঙালিকে যিনি প্রথম করে দিয়েছিলেন তিনি বাংলা সনেটের একমাত্র আদিগঙ্গা-ভগীরথ মধুসূদন দত্ত। তার কারণ মধুকবির লেখার আগে, চর্যাপদ ও বৈষ্ণব পদাবলীতে যেসব চৌদ্দ চরণের কবিতা পাওয়া গেছে, সেগুলোর কোনোটাতেই সনেট প্রণীত লক্ষণগুলি প্রায় উপস্থিত নেই বললে চলে। তাছাড়া শুধু চৌদ্দ চরণের সঙ্গে পয়ারী মাত্রাসংখ্যা থাকলেই যে সনেট হয়ে উঠবে, এমন তো নয়। এর যে বাহ্যিক ও অন্তর্নিহিত বিচরণ সহ অন্যান্য লক্ষণ আছে, সেগুলো চর্যাপদ তথা বৈষ্ণব সাহিত্যে কোথায়? আর যেহেতু সনেট ব্যাপারটাই উৎপত্তিগতভাবে সম্পূর্ণই ইউরোপীয়, রূপ-গুণ-বৈচিত্র্য সহ গঠনবিন্যাসও প্রথমত ও প্রধানত তাদের হাতেই তৈরি সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে যে প্রাচীন বাংলা কাব্যে চৌদ্দ চরণের কবিতা থাকলেও সনেটের রেশ তৎকালীন সময় বাংলা কাব্যে পড়েনি। এছাড়াও উৎপত্তিগতভাবে ইউরোপের বিভিন্ন স্থান, ব্যক্তি ও কালের মতানৈক্য সহ সনেটের উদ্ভবকে যদি দেখি, তাহলে দেখা যায় সনেটের জন্ম একাদশ শতকে নয়তো ত্রয়োদশ শতকে নয়তো চতুর্দশ শতকে হয়েছে। আর সনেটের সার্থকতা ও প্রতিষ্ঠার কথা যদি বলি, তাহলে চতুর্দশ শতকে ইতালির নবজাগরণের যুগসন্ধিতে আবির্ভূত ফ্রন্সেস্কো দ্যি পেত্রার্কই এর মূল পথিকৃৎ। সমালোচক কুন্তল চট্টোপাধ্যায় সহ হীরেন চট্টোপাধ্যায় তো এও মনে করেন যে আসলে সনেটের জনক পেত্রার্কই। অতএব অতি সাধারণভাবেই বোঝা যাচ্ছে যে চর্যাপদের সময় সনেট বলে বিশ্বসাহিত্যের কোত্থাও কিচ্ছু ছিল না। থাকা নির্দিধায় অসম্ভব। তাই চর্যাপদে চৌদ্দ চরণের কবিতা থাকলেও সনেটের অস্তিত্ব অনুমান ও স্বীকার করা নিতান্তই হাস্যস্পদ। তৎসঙ্গে এও সত্য যে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে আবির্ভূত সনেট রীতি তৎকালীন সময়ের বৈষ্ণব কবিদের হাতে এতো দ্রুত এসে ধরা দেওয়া সম্ভবপর ছিল না। এর পরবর্তী এক-দুই শতকে অন্তিম বৈষ্ণবপদ রচিত হওয়াকালীন সময়ের মধ্যে ইউরোপ থেকে সনেট এসে বাংলা বৈষ্ণব কাব্যে প্রয়োগের যে সুযোগ এবং সম্ভাবনা একেবারেই ক্ষীণ ছিল, তাতেও তেমন কোনো দ্বিধা না থাকাই যথোপযুক্ত। তাই প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলায় মধুর-রস-ধ্বনিমূলক কাব্য কিংবা কবিতা থাকলেও, 'sonnetto' (a little sound or song) এর প্রতিশব্দমূলক 'মৃদুধ্বনি' বা 'মন্ময়ধ্বনি' জাতীয় কোনো কাব্য কিংবা কবিতা নেই। বলাইবাহুল্য, এই 'নেই'টাকেই অস্তিত্বশীল করে তুলতে আধুনিক যুগে এসে বাংলা ভাষায় সনেটের প্রথম জাগরণ করেছিলেন- ১৮৬০ সালে কলকাতায় থাকাকালীন সময়ে 'কবি-মাতৃভাষা' নামক প্রথম সনেট কবিতা রচনার মাধ্যমে একমাত্র মধুসূদনই।

ব্যাপার হল প্রত্যেক আরম্ভেরও আরম্ভ থাকে। মধুসূদন একেবারে প্রথম কিন্তু সনেট রচনা করেছিলেন ইংরেজি ভাষায়। হিন্দু কলেজের ছাত্র থাকাকালীন সময়। বাংলার প্রতি তখন তাঁর বিজাতীয় ঘৃণা। মুখে মুখে

বুলবুলির মতো ইংরেজি কবিতা বেরোনোর কারণে তখন বেশ কিছু ইংরেজি সনেট লিখেছিলেন। তাঁর লেখা প্রথম যে-ইংরেজি কবিতা 'My fond sweet Blue eyed maid', সেটা তিনি লিখেছিলেন ২৮ মার্চ ১৮৪১ সালে। অর্থাৎ তখন তাঁর বয়স মাত্র সতেরো বছর। সে-বয়সেই তাঁর কাব্যভাষা কী পরিপক্কতার চূড়া স্পর্শ করেছিল, কবিতাটি পড়লেই বোঝা যায়। কী নিখুঁত ছন্দ ও নিপুণ অন্ত্যমিল ছিল এই কবিতায়! কবিতাটির মিলবিন্যাস ছিল— ababcdcd Ges rhythm: iambic tetrameter with alternative iambic trimeter। স্পষ্টতই বোঝা যায়, ইংরেজি সনেট লেখার সূক্ষ্ম সব কলা-কৌশল রপ্ত করে ফেলেছিলেন মধুসূদন সেই অল্প বয়সেই। অধ্যাপক সায়ীদ আবুবকরের সমর্থনে এটা বলা যেতে পারে যে, ১৮২৮ সালে কলকাতায় নির্মিত ওচটারলোনি মন্যুমেন্টকে নিয়ে (বর্তমানে যেটি শহীদ মিনার) ১৮৪২-এর দিকে লেখা মধুসূদনের ইংরেজি সনেটটি-ই হল তাঁর লেখা প্রথম সফল সনেট। সনেটটির মধ্যে কবি ব্যাজস্তুতি ও শ্লেষোক্তির মাধ্যমে ব্রিটিশ যোদ্ধা মেজর জেনারেল স্যার ডেভিড ওচটারলোনির সম্মানে নির্মিত এ স্মৃতিসৌধটির গুণকীর্তন করতে গিয়ে দীনহীন ভারতবাসীর করুণ দুর্দশাগ্রস্ত চিত্র তুলে ধরেছিলেন। তাই আমি মনে করি শুধুমাত্র 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' তর্জমা নয় মধুসূদনের ইংরেজি সনেটগুলিও বিশেষ করে পাঠকের গভীরতর মনোযোগের দাবি রাখে কারণ এদের কাব্যিকমূল্য দুর্ভাগ্যবশত কম হলেও ফেলনা নয়। মধুসূদনের বিবর্তন ও আঙ্গিক বুঝতে এগুলো বিশেষ সহযোগী।

এরপর ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসের সময় মেঘনাদবধ কাব্যের দুটো সর্গ যখন লেখা শেষ, এদিকে 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকও ছাপার জন্য প্রস্তুত ঠিক তখনই আবার সনেট রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন; তাও বাংলায়। ঐ সময় মধুসূদন এক চিঠিতে 'কবি-মাতৃভাষা' সনেটটি লিখে পাঠিয়েছিলেন এবং তৎসঙ্গে চিঠিতে লিখেছিলেন— "I want to introduce the sonnet into our language and some morning ago, made the following... What you say to this my good friend! in my humble opinion, if cultivated be men of genius, our sonnet in time would rival the Italian."[৪] তবে এই সনেট রচনার পেছনেও আরেকটা কারণ রয়েছে। 'The captive ladie' ও 'Vision of the past' দুটো ইংরেজি কাব্য মাদ্রাজে থাকাকালীন সময় লিখেছিলেন এবং সেখানকার বিভিন্ন পত্রিকায় এগুলোর বিশেষ প্রশংসাও ঘটে। এদিকে রেবেকার ধর্মপিতা নর্টন সাহেব সহ কলকাতার বন্ধুবান্ধব সকলেই প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ঠিক তখন তৎকালীন শিক্ষাসচিব জন ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন সাহেব এক উপদেশমূলক মন্তব্য করেছিলেন মধুসূদনকে এবং বন্ধু গৌরদাস বসাক ঠিক অনুরূপ অনুরোধ জানিয়ে চিঠিও লিখেছিলেন। ফলত উপদেশ ও অনুরোধ দৈববাণীর মতো গ্রহণ করে বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেছিলেন মধুসূদন। এরপর আর কখনো তিনি এক চরণ অবধি ইংরেজিতে লেখেননি। উপরোক্ত সনেটে বঙ্গমায়ের প্রতি যে নিবিড় সমর্পণ রয়েছে তা ঐ দুজন ব্যক্তির চিঠির তীব্র প্রভাবের ফসল বলা যেতে পারে। এই কবিতায় মধুসূদনের বিদেশি ভাষার সাহিত্যের প্রতি ভ্রান্ত অনুরাগের ফলে দুঃসাধ্য প্রচেষ্টা ও ভাগ্য সহায়ের কারণে মাতৃভাষায় ফিরে আসা, সার্থকতা ও বিদেশী সাহিত্যে সিদ্ধিলাভের মিথ্যে আকাঙ্ক্ষার কথা বলেছিলেন তিনি। এই সনেটটি পরবর্তীতে পরিমার্জিত হয়ে তাঁর লেখা 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে 'বঙ্গভাষা' নামে স্থান পায়।

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন;
তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।

কাটাইনু বহু দিন সুখ পরিহরি।
অনিদ্রায়, নিরাহারে সঁপি কায়, মনঃ
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি; -
কেলিনু শৈবালে; ভুলি কমল-কানন!
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে -
"ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে!"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে
মাতৃভাষা-রূপ খনি, পূর্ণ মণিজালে।[৫]

সনেটটি রীতি বা মিলের দিক থেকে দেখলে অনিয়মিত ধরনের। শেক্সপিরীয় ও পেত্রার্কীয় রীতির সংমিশ্রণে লেখা সনেটটির, প্রথম চারটি চরণ ও শেষ দুটি চরণ খাঁটি শেক্সপিরীয় রীতির, পঞ্চম থেকে অষ্টম চরণ অবধি অনিয়মিত শেক্সপিরীয় ঢঙে লিখেছিলেন আর নবম থেকে দ্বাদশ চরণ আবার পেত্রার্কীয় ঢঙে লিখেছিলেন মধুসূদন।

মধুসূদন উপরোক্ত 'কবি-মাতৃভাষা' সনেট রচনার প্রায় দুই বছর পর ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দের ৯ জুন ব্যারিস্টারি পাশ করার জন্য ইংল্যান্ডে যাত্রা করেন এবং প্রধানত আর্থিক অস্বচ্ছলতার দরুন সেখান থেকে ১৮৬৩ সালের মে মাসে ফরাসিদেশের ভার্সাই শহরে থাকার ব্যবস্থা করেন। ১৮৬৪ সালের শেষের দিকে তাকে আবার চরম দারিদ্র্যের মুখোমুখি হতে হয়। এর ঠিক কয়েক মাস পরে সেখানে থাকাকালীন ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে ২৬ জানুয়ারি ভার্সাই থেকে বন্ধু গৌরদাস বসাককে চিঠিতে জানান তিনি সনেট রচনার ব্যাপারে পেত্রার্ককে অনুসরণ করছেন— "I have been lately reading Petrarch, the Italian poet, and scribblings after his manner."[৬] এও জানান যে— "I dare say the sonnet 'চতুর্দশপদী' will do wonderfully in our language."[৭] (প্রসঙ্গত বাংলায় সনেটকে 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' বলে প্রথম মধুসূদনই উল্লেখ করেছিলেন।) চিঠির সঙ্গে চারটি সনেটও পাঠিয়েছিলেন তিনি- 'অন্নপূর্ণার ঝাঁপি', 'জয়দেব', 'সায়ংকাল' আর 'কপোতাক্ষ নদ'। অবশ্য এর মধ্যে 'কপোতাক্ষ নদ' ও 'সায়ংকাল' এই দুটো সনেট 'রহস্য সন্দর্ভে' কিছুদিন পরে বাংলায় প্রকাশিত প্রথম সনেটের মর্যাদাও পায়। তাঁর লেখা 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র মধ্যে দুটি ছিল সনেট উপক্রম। 'উপক্রম ১'-এ তিলোত্তমাসম্ভব, মেঘনাদবধ কাব্য, বীরাঙ্গনা ও ব্রজাঙ্গনা প্রভৃতি কাব্যের উল্লেখ করে আত্মপরিচয় দিয়েছেন- "সেই আমি, শুন, যত গৌড়-চূড়ামণি!" আচ্ছা কাব্যের শুরুতে মধুসূদন এরকম আত্মপরিচয় দেওয়া বোধ করেননি, কিন্তু সনেটের ক্ষেত্রে কেন এর প্রয়োজন বোধ হল? সনেট রচনা করতে গিয়ে অবশয্ই হয়ত তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছিল, তিনি তাঁর হৃদয়ের বিপুল ও গভীর পরিচয় সনেটে তোলে ধরতে পারবেন কিনা? এইজন্যই বোধহয় পরবর্তী 'উপক্রম ২'-এ তিনি ইতালীয় কবি পেত্রার্ককে স্মরণ করে সেই দিকটা হালকা করতে চেয়েছেন।

১৮৬৬-তে প্রকাশিত তাঁর লেখা 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র ১০২টি সনেটের সবগুলোই মোটামুটি তাঁর অনুতাপ, সঙ্কোচ, ব্যক্তিগত জীবন, সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতন, ভালো-মন্দ, অপরাধবোধ, মানসিক দ্বন্দ্ব, জ্বালা-উত্তেজনা ও অন্তর্নিহিত মনোভাবের অন্তিম প্রকোষ্ঠের সর্বোত্তম ব্যঞ্জনা। মেঘনাদবধ কাব্য, বীরাঙ্গনা

ও ব্রজাঙ্গনা প্রভৃতিতে মধুসূদন শিল্পী হিসেবে সমুচ্চ পরিচয় রেখে গেছেন ঠিকই- কিন্তু সেখানে তিনি কিছু বেশিই ছিলেন পোশাকী। Art for arts sake এর ভাবটাই ছিল তুলনামূলক বেশি। নিজের কথা কতটাই বা উলঙ্গ হয়ে বলতে পেরেছিলেন সেগুলোতে? অবশ্যই সেগুলোতেও রয়েছে, অস্বীকার করছি না। পত্নী রেবাকাকে প্রেম করে বিয়ে করা সত্ত্বেও পরবর্তীতে যে স্ত্রী-পুত্র সহ নির্মমভাবে ছেড়ে চলে আসার ফলে স্ত্রী-পুত্রের স্মৃতি জগরণে মনোবেদনায় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে মর্মস্পর্শী কবি স্ত্রীর অন্তর্বেদনা লিখলেন 'বীরাঙ্গনা'র 'দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা', 'সোমের প্রতি তারা', 'দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী', 'দশরথের প্রতি কৈকেয়ী' প্রভৃতিতে। কিন্তু দ্বিতীয় পত্নী হেনরিয়েটাকে লক্ষ্য করে অন্যত্র কোনো লেখা নেই তো তাঁর। 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র শিরোনামহীন ১০০ সংখ্যক সনেটে প্রেম প্রসঙ্গ গোপন করেও হয়ত হেনরিয়েটাকে নিয়েই লিখেছেন। এই যে অসমাপ্ত ঝেড়ে ফেলার কাজ অবশিষ্ট ছিল, তারই সমাপ্তিতেই রচনার প্রয়োজন ছিল এই 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র। মূলত যে পাঠক 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র আগে মধুসূদনের অন্যান্য জীবনালেখ্য ও সৃজনীপ্রতিভার পরিচয় রাখে চতুর্দশপদী কবিতা পড়ার পর এই বিরল কাব্যক্ষমতা অধিকারী কবির কাব্য-জীবনের আলাদা ধরনের ধ্যান-ধারণাকে অনুভব করা তার পক্ষে তখনই সম্ভব হবে। বস্তুত মহাকাব্য, নাটক সহ পত্রকাব্যের পরও মধুসূদনের প্রতিভা যেন নতুন কোন বাঁকের সন্ধানী হয়ে উঠল দেশান্তরের অবস্থায়, নতুন অনুভব ও অভিজ্ঞতার পরশে। সনেট রচনার ক্ষেত্রে প্রথমেই দুটো বিষয় স্পষ্ট ছিল যে- পেত্রার্ক অনুসরণে মধুসূদন যে সনেটের প্রচলন করেছিলেন তার কুলমর্যাদা অতুলনীয়। অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যে এখনো অবধি সনেট রচনার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন সংগঠনগত পরিবর্তন ও যে স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়, মধুসূদনের সনেট সেখানেও এখনো ফর্মের দিক থেকে অনন্য। অপরটি হল, মহাকাব্য এবং পত্রকাব্যে তাঁর কাব্য কল্পনার যে বহুল বিচরণ দেখা গিয়েছিল, সনেটে ঠিক তার বিপরীত সংহত রূপ দেখে থমকে যেতে হয়। মেঘনাদবধে কবিকল্পনার স্বেচ্ছাচারিতায় যতটা প্রয়োজন বর্ণনার বিষয়কে ভিত্তি করে কবিকল্পনা, সেখানে তা বহুবিস্তৃত সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনায় বিচরণশীল ছিল। পত্রকাব্যেও এই উন্মুক্ত স্বাধীন মনোভাব বজায় রেখেছিলেন। কিন্তু সনেটের স্বল্প আয়তনে চৌদ্দ পঙক্তি ও চৌদ্দ মাত্রায় যে সংহতির অবলম্বন করেছিলেন, তাঁর উচ্ছ্বাসময় চরিত্র ও আচরণের দিকে নজর দিলে, এটা সত্যিই আশ্চর্যের ব্যাপার।

এই জনয্ই মধুসূদনকে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের সাথে তাল মিলিয়ে উড়নচণ্ডী বন্ধন-অসহিষ্ণু মুক্তপক্ষ বিহঙ্গ যতই বলা হোক না কেন, তিনি যে নির্দিষ্ট প্রকরণ অনুসরণ করে অমিত্রাক্ষরের গতিতে চৌদ্দ মাত্রার চৌদ্দ পঙক্তিতে বিচরণ করলেন এবং পাঠকদের বন্ধন মাঝে মহানন্দের স্বাদ বেড়িভেঙে আস্বাদন করালেন তাকেও তো Swan song না বলে উপায় নেই। আসলে তিনি তো কোনো ধরনের বাঁধা-বিধি নিয়মের তোয়াক্কা করেননি। বারবার নিজেকেই বিবর্তিত করেছেন। আর এই বারবার পাল্টে দেখার কাজই একজন সার্থক শিল্পী করে থাকেন। জীবনের শেষে কবিরা প্রায় ক্ষেত্রেই নিঃশেষিত হয়ে আসেন, একটা শিথিলতা চলে আসে। তা সত্ত্বেও মধুসূদন যে কবিকর্মে স্বকীয় দক্ষতায় নতুন প্রকরণ গড়ে তোলে গেলেন, তা সত্যিই তাঁর ক্ষমতাকে আমাদের সামনে উদাহরণ হিসেবে প্রকট করে।

তবে প্রকৃত প্রস্তাবে আধুনিক পাঠকের দৃষ্টিতে আঙ্গিকের দিক থেকে মধুসূদনের সনেট খুব উল্লেখযোগ্য ব্যাপ্তির ধারক নয়। তাঁর সনেট যে নিখুঁত, বলা যায় না। 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র সনেটগুলো পেত্রার্ককে অনুসরণ করে লিখলেও 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র অসংখ্য সনেটের মধ্যে কয়েকটিতে মাত্র পেত্রার্ক অনুসৃত অষ্টক ও ষটকের ভেদরেখা লক্ষ্য করা যায়। বেশিরভাগ সনেটেই এই বিভাজন স্পষ্ট নয়। একটি ভাব থেকে এক শ্বাসে বোঝা যায় শেষে চলে গেছেন। পড়লে মনে হয় কোনো উত্থান-পতন ও বিরাম

নেই সেইগুলোতে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, 'বঙ্গদেশে এক মান্য বন্ধুর উপলক্ষে', 'হিড়িম্বা'(৬৩ নং), 'যশঃ', 'সুভদ্রা', ও 'নূতন বৎসর' সহ অন্যান্য আরো অনেকগুলো সনেট। অধিকাংশ কবিতার ভাবও রসালো নয়, শিথিলতায় ভরা। দৃঢ় বদ্ধপরিকর নয়- এলায়িত চলাচল লক্ষিত হয়। কোনো কোনো সনেটে স্বভাবদোষে চলে এসেছে নিটোল স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাব অপেক্ষা মহাকাব্যের মতো অসংখ্য উপমা ব্যবহার করে গল্প বলার ঝোঁক। সনেটের ভাব সংহতি ও ভাব-সম্পূর্ণতার জন্য যে ইটপাথর দরকার ছিল দুঃখজনকভাবে মধুসূদনের সনেটে এর অনেকটাই অভাব। অখন্ডভাবের তীক্ষ্নবজ্র খুব কম সনেটেই দেখা যায়। কিন্তু কয়েকটি সনেট ছাড়া বাকি ক্ষেত্রে গীতিকবিতার ব্যঞ্জনা অনুভব করা যায় এবং সার্থক সনেট রচনার ক্ষেত্রে এই বাধা অপসারণের চিন্তা মধুসূদনের ছিলই না। তৎসঙ্গে এও স্বীকার করতে হয় মধুসূদনের সময় বাংলা শব্দকোষের দৈন্যতা ও নগণ্যতায় সীমাবদ্ধ পরিসরে ভাব ও ভাষার ব্যবহারের প্রতি যথেষ্ট সজাগ ও সচেতন থাকা সত্ত্বেও সমীকরণ মেলানো ততটা সম্ভব হয়নি। অবশ্য তিনি শেক্সপিয়রীয় সনেটের রীতির আঙ্গিক ধরে বেশ কিছু সনেটকে আঙ্গিক-সুষমায় সমুজ্জ্বল করে তুলেছিলেন। বিখ্যাত 'কাশীরাম দাস' সনেট এরই সার্থক রূপ। ভাব-বিন্যাসের দিক থেকে মধুসূদনের সকল সনেটই প্রায় শেক্সপিয়রীয় সনেটের অনুগামী। সেখানে প্রথম থেকে শেষ অবধি সনেটগুলির সংগতি ও ক্রমবিকাশের দ্বারা তিনি অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। প্রসঙ্গত, মূলত পেত্রার্ক ও শেক্সপিয়ারকে অনুসরণ করলেও অসংখ্য অনিয়মিত ও মিশ্ররীতির কলানৈপুণ্যে ভাস্কর্য-সুঠাম দুষ্প্রাপ্য-মনোহর সনেটই তাকে দীপ্তিময় করে তুলেছে। এরকম মিশ্রণ-সংমিশ্রণের খেলায়ই মেতে উঠেছে মধুসূদনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র বেশিরভাগ অংশ।

এখন মধুসূদনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'কে বিষয়ভেদে ও ভাবকেন্দ্র অনুসারে যদি সাজাই তাহলে বোঝা যাবে যে, কোথাও তিনি মানসপ্রবণতা ও প্রবৃত্তি, বিশেষ জীবনদর্শন ও আসক্তি, বিশেষ বিশেষ রূপকল্পের প্রতি আকুতি প্রকাশ করেছেন; তবে তার সঙ্গে প্রকাশ করতে সচেষ্ট হয়েছেন 'ব্যক্তি-আমি'টাকে। কোথাও বাংলা তথা ভারতবর্ষের কবি ও কাব্যের কাব্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে কাব্য-কবিতার রসকে ছন্দ-ভাষায় অমর করতে চেয়েছেন। কোথাও তাঁর স্বভাবসুলভ বৈশিষ্ট্যে পৌরাণিক সাহিত্যের মারফতে অর্থাৎ মহাভারত-রামায়ণ-ভাগবত প্রভৃতির চরিত্র, খন্ড কাহিনি ও দৃশ্যের দৌলতে বারংবার খুঁজতে চেয়েছেন শিকড়ের মন্দ। কিছু সনেটে ব্যক্ত করেছেন দেশ-জাতি পরকাল ও যুগান্তরের সব ঐতিহ্য। কিছু কিছু সনেট ছিল ভাষা, ছন্দ ও রসকে ঘিরে। আবার চার পাঁচটা সনেট ছিল বিদেশি কবিদের শ্রদ্ধা জানিয়ে লেখা, যাদের দ্বারা তিনি সনেট সহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রভাবিত। কিছু সনেট ছিল সমসাময়িক ব্যক্তি-বিশেষকে কেন্দ্র করে। সামান্য কয়েকটিতে সনেটে ছিল ব্যক্তি-প্রেমের কথা। কোথাও কোথাও লিখেছেন নীতিমূলক ও ধর্মতত্ত্বমূলক সনেট। প্রকৃতির নিবিড় আবেশে সৌন্দর্যবোধ ও ভাবাসঙ্গ এর উপর লিখেছেন বেশ কিছু সনেট।

এই বিভিন্ন ধরনের সনেটগুলোর বিভিন্ন স্তরে কবির মানসিক প্রবণতা ও হাবভাবের স্পষ্ট রেখা দেখা যায়। তবে কাব্য হিসেবে তাদের অনেকগুলোর মূল্য গুণোৎকর্ষের দিকে ততটাও নয়। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে কবির বিধ্বস্ত হৃদয়ের কথা, নানা স্তরে রূপে-বর্ণে পরম সমারোহ- এগুলো তো এড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপার নয়। সে যাই হোক মধুসূদনের সব সনেটেই তাঁর মনের আর্তি প্রকাশ পেয়েছে। অবশ্য ভাবভাবনা কবিতাগুলিতে সংযতই ছিল। সেগুলোকে আধুনিক গীতিকবিতা বললেও কোনো অন্যায় হবে না। কারণ W.H Hudson গীতিকবিতাকে দেখেছেন এভাবে— "Personal or subjective poetry of self-expression or self-delineation."[৮] সেই অনুপাতে মধুসূদনের এই সনেটগুলোকে অবশ্যই আধুনিক

গীতিকবিতা বলা যেতে পারে। মধুসূদন নিজের সম্পর্কে বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লেখা চিঠিতে যে স্বীকারোক্তি করেছিলেন সেটা এখানে উল্লেখ করতেই হয়- 'বন্ধু রাজ, তোমাকে আমি হলপ করে বলতে পারি, আমি দেখা দেবো একটা বিশাল ধূমকেতুর মতো— এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।'[৯] আসলেই পরবর্তীতে তার কোনো সন্দেহ আর থাকেনি।

তথ্যসূত্র :

১) An Introduction to the Study of Literature, William Henry Hudson, Atlantic Publishers & Didtributors, 2006, pp-103.
২) The music of Poetry, T.S Eliot, Glawsow Jackson, Son & Company, 1942.
৩) সনেট পঞ্চাশৎ, প্রমথ চৌধুরী, সিদ্ধেশ্বর মেশিন প্রেস, প্রকাশ কাল-১৯১৩, পৃ: ১।
৪) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, আধুনিক যুগ (প্রথম পর্ব), ড. শ্রীমন্তকুমার জানা, ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, প্রকাশ কাল-২০২২, পৃষ্ঠা: ৫৫২।
৫) চতুর্দশপদী কবিতাবলী, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী সজনীকান্ত দাস (সম্পাদনা), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, প্রকাশ কাল- ১৮৬৬, পৃ: ২।
৬) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, আধুনিক যুগ (প্রথম পর্ব), ড. শ্রীমন্তকুমার জানা, ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, প্রকাশ কাল- ২০২২, পৃ: ৫৪৮।
৭) ঐ, পৃ: ৫৫৬।
৮) An Introduction to the Study of Literature, William Henry Hudson, Atlantic Publishers & Didtributors, 2006, pp-96.
৯) কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী, ক্ষেত্রগুপ্ত, গ্রন্থনিলয়, প্রথম প্রকাশ- বৈশাখ, ১৩৭০।

সহায়ক গ্রন্থ :

১) চতুর্দশপদী কবিতাবলী, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও শ্রী সজনীকান্ত দাস (সম্পাদনা), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, প্রকাশকাল- ১৮৬৬।
২) মুধুসূদন রচনাবলী (ইংরেজি সহ সমগ্র রচনা একখণ্ডে), ডক্টর ক্ষেত্রগুপ্ত (সম্পাদনা), সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ- অক্টোবর, ১৯৫৫।
৩) সাহিত্যের রূপভেদ রূপরীতি নির্ণয়, সুধাংশুশেখর মণ্ডল, প্রজ্ঞাবিকাশ, প্রথম প্রকাশ- ডিসেম্বর, ২০০৫।
৪) সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ- আগস্ট, ১৯৯৫।
৫) সাহিত্যের রূপ ও রীতি, ড. দিলীপকুমার রায়, গ্রন্থতীর্থ, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি, ২০০৫।
৬) সাহিত্য প্রকরণ, হীরেন চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ- বৈশাখ, ১৪০২।

৭) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড), আধুনিক যুগ, ড. দেবেশ কুমার আচার্য্য, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, প্রথম প্রকাশ- আগস্ট, ২০০৪।

৮) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৩য় খণ্ড), সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ- ১৩৫০।

৯) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, আধুনিক যুগ (প্রথম পর্ব), ড. শ্রীমন্তকুমার জানা, ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, অন্তিম প্রকাশ- ২০০৮।

১০) বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস, ক্ষেত্রগুপ্ত, গ্রন্থনিলয়, প্রকাশ কাল- ২০২৩।

১১) সনেট পঞ্চাশৎ, প্রমথ চৌধুরী, সিদ্ধেশ্বর মেসিন প্রেস হইতে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ফাল্গুন ১৯১৩।

১২) উনিশ শতকের বাঙালিজীবন ও সংস্কৃতি, স্বপন বসু ও ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী (সম্পাদনা), পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ- নভেম্বর, ২০০৩।

১৩) আশার ছলনে ভুলি, গোলাম মুরশিদ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ- ১৯৯৮।

১৪) মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত, শ্রী যোগীন্দ্র নাথ বসু বি. এ. প্রণীত, ভারতমিহির যন্ত্রে সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত, প্রকাশ কাল- ১৯০৫।

১৫) মধুসূদন : সাহিত্যপ্রতিভা ও শিল্পী-ব্যক্তিত্ব, দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ (সম্পাদনা), পুথিপত্র, প্রথম প্রকাশ- অক্টোবর, ১৯৫৬।

১৬) মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরকাল , কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, ডি. মেহরা, রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী, প্রথম প্রকাশ- অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭।

১৭) সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ, জগদীশ ভট্টাচার্য, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ- চৈত্র, ১৩৬৪।

১৮) কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী, ক্ষেত্রগুপ্ত, গ্রন্থনিলয়, প্রথম প্রকাশ- বৈশাখ, ১৩৭০।

১৯) মধুসূদনের কবি-আত্মা ও কাব্যশিল্প, ড. ক্ষেত্র গুপ্ত, এ. কে. সরকার অ্যাণ্ড কোং (পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক), প্রকাশ কাল ১৩৬৭।

২০) সাহিত্য-সঙ্গ, আব্দুল আজীজ আল-আমাল, এস মল্লিক (প্রকাশক), কলিকাতা ১২, প্রথম প্রকাশ- শ্রাবণ, ১৩৬৫।

২১) বাঙলা সনেট, জীবেন্দ্র সিংহরায় ও শক্তিব্রত ঘোষ (সম্পাদনা), কথাশিল্প, প্রথম প্রকাশ- ১লা বৈশাখ, ১৩৬৩।

২২) An Introduction to the Study of Literature, William Henry Hudson, Atlantic Publishers & Distributors, 2006.

২৩) A house of life, Dante Gabriel Rossetti, Harvard University Press, 1881.

২৪) The music of Poetry, T.S Eliot, Glawsow Jackson, Son & Company, 1942.

২৫) Poems in Two Volumes (Vol-1), William Wordsworth, London: Longman, Hurst, Rees, and Orms. 1807.

অভিধান/কোষ গ্রন্থ :

১) পবিত্র সরকার, ব্যাবহারিক বাংলা বানান অভিধান, লতিকা প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ : ২০১৮।